অর্গানাইজেশন, কালচার অ্যান্ড জেন্ডার
একটি উপেক্ষিত প্রাসঙ্গিক ভাবনা

কামরুন মুন্নি

মূলত অর্গানাইজেশন বা সংগঠন বলতে আমরা বুঝি এক বা একাধিক ব্যক্তির সহযোগিতার ভিত্তিতে বা সমবেত প্রচেষ্টায় কাজ করার প্রণালি। আরো খানিকটা অর্থবহ ও সুস্পষ্ট করার জন্য বলা যায়, সংগঠন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে এবং কাজের প্রকৃতি অনুসারে যোগ্যতা ও বিশেষজ্ঞতার আলোকে দায়দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, কর্মরত কর্মী ও কর্মকর্তার মধ্যে সম্পর্কের কাঠামো নির্ধারণ করা হয় এবং কাজের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ও সুসংহত করা হয়। সূত্র ধরে বলা যায়, অর্গানাইজেশনাল কালচার বা সাংগঠনিক সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সংগঠনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত আচার-ব্যবহার, মূল্যবোধ, লক্ষ্য, বিশ্বাস, চর্চিত অভ্যাস ইত্যাদি। এবং এই সাংগঠনিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক পরিবেশের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যেহেতু সংগঠন একটি ব্যক্তিনির্ভর সংস্থা, তাই এর পরিবেশ ও সংস্কৃতির বাহক এবং ধারক উভয়ই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ওপর নির্ভরশীল।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে সংগঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। খোলাচোখে তাকালে বোঝা যায় যে আমাদের ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনেও চলে আসছে এই সংগঠনের প্রভাব। কারণ মুক্তবাজার অর্থনীতির এই সময়ে আমরা সংগঠন এবং এর সংস্কৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং প্রভাবিত। ব্যবসায়িক বা সামাজিক সত্তার পরিচিতি ছাড়াও সংগঠনকে যদি আমরা ক্ষমতা বা নেতৃত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করি এবং লিঙ্গবৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করি তাহলে সংগঠনের একটা কালোরূপ আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠতে দেরি হবে না। খুব সহজেই ফুটে উঠবে সাংগঠনিক সম্পর্কের কাঠামো নির্ধারণ এবং ক্ষমতা বিভাজনের অপব্যবহারগুলো। একই সাথে সংগঠন এবং এর সংস্কৃতিকে যদি লিঙ্গবৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে আমরা পেয়ে যাব কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মূল্যবোধ, আদর্শ এবং সম্মিলিত আচার-ব্যবহারের ব্যক্তিক প্রয়োগ; এবং সেক্ষেত্রে আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়ে যাবে অনেক গল্প বা ঘটনা, যা সংগঠনের অন্ধকার দিককে তুলে ধরতে কার্পণ্য করে না।

কেন আমরা সংগঠনকে লিঙ্গবৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখব অথবা এভাবে দেখা কতটা জরুরি? উত্তরটা হচ্ছে— নারীর অবস্থান পরিমাপ এবং পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর স্বরূপ উন্মোচনের নিমিত্তেই

আমাদের সংগঠন, এর কৌশল এবং লিঙ্গবৈষম্য ও এর অপব্যবহার সম্পর্কে জানতে হবে, আলোচনা করতে হবে। সর্বোপরি সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। কারণ সংগঠনের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যই বলে দেয় যে এখানে অর্পিত ক্ষমতার মাধ্যমে সম্পর্কের কাঠামো নির্ধারণ করা হয়। ক্ষমতা বা নেতৃত্ব সর্বদাই পুরুষবাচক ইঙ্গিত প্রকাশ করে, যেখানে নারীমাত্রই ক্ষমতাহীন বা সীমিত ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

সংগঠন বা সংগঠনতত্ত্ব মূলত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই রচিত, যেখানে নীতিনির্ধারক শ্রেণি পুরুষালি মনোভাবে বিশ্বাসী এবং অধস্তন শ্রেণি নিজেদের আদেশ পালনকারী বা দ্বিতীয়লিঙ্গ ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। যুগ যুগ ধরে সংগঠন ঠিক এভাবেই তার ক্ষমতার একটি অপব্যবহার জারি রেখেছে, যা সংগঠনের একটা অন্ধকার দিক। এই অন্ধকার দিকে আরো আঁধারের প্রলেপ লাগাতেই সংগঠনের অভ্যন্তরে নারীর নারীত্বের যেমন অপব্যবহার চলে, তেমনি চলে তাদের কর্মের অবমূল্যায়ন। যদিও সংগঠনের উচ্চ পর্যায়ে স্বল্পসংখ্যক নারীনেতৃত্ব দেখা যাচ্ছে আজকাল, তবু বহুলাংশে তা নির্ভর করে পুরুষ নেতৃত্বের (ভোটাধিকার, অনুমোদন ইত্যাদি) ওপরে, অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্বুদ দ্বারা নারীনেতৃত্ব ঘেরাও থাকে, যা ভাঙা নারীর পক্ষে দুষ্কর হয়ে ওঠে। উলটো দিকে দেখলে দেখা যায়, ক্ষমতার এ চরকায় নারী পরিণত হচ্ছে বস্তু বা পণ্যে।

কেন ও কীভাবে

করপোরেট কালচার হচ্ছে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মূল্যবোধ, আচার-ব্যবহার, মতাদর্শ এবং চর্চিত বিশ্বাস। প্রতিষ্ঠান কাঠামো বা এর গঠনতন্ত্রের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতাহীন। তবে ক্ষমতাহীন যে কখনো ক্ষমতাবান হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে না তা নয়; এবং এটি একটি ঘূর্ণন পদ্ধতি, যেখানে ঘুরে ঘুরে সর্বদা এই দুই পক্ষই বিরাজমান। যেহেতু ক্ষমতা তার ক্ষমতার চাহিদাকেই বাড়িয়ে তোলে, তাই লুকানো পন্থা অবলম্বনও এখানে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে, যা আসলে ছায়ার মতন সাংগঠনিক কাঠামো দ্বারা পরিবেষ্টিত। (কান্টার ও মস, ম্যান অ্যান্ড ওমেন ইন কোঅপারেশন, ১৯৭৭)।

অর্থাৎ বলা যেতে পারে, সংগঠনের একটি অন্ধকার দিক যা উন্মোচন করার চাইতে অনুধাবন করা সহজ এবং এই কাঠামোর আড়ালেই নিয়ত নারীকে বানানো হচ্ছে পণ্য, ব্যবহার করা হচ্ছে অনৈতিক উপায়ে ক্ষমতা হাসিলের অন্যতম উপাদান হিসেবে, যা আমাদের ক্রমশ ধাবিত করছে একটি অসুস্থ সাংগঠনিক সংস্কৃতির দিকে, যেখানে কখনো স্বেচ্ছায় বা কখনো অনিচ্ছায় নারী শিকার হচ্ছে তার নারীত্বের অবমাননার।

নারী শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হচ্ছে, জীবনের প্রয়োজনে নিয়ত লড়াই করে চলেছে। অনেকেই পৌঁছে গেছেন সফলতার উচ্চ পর্যায়ে, আবার অনেকেই আছেন সফলতার পথে। এরই মাঝে সংগঠনের কথিত লুকানো পন্থার বদৌলতে ক্ষমতার মোহে পড়ে কেউ কেউ বাধ্য হন, আবার অনেকেই স্বেচ্ছায় ধরা দেন অসুস্থ ও অনৈতিক প্রতিযোগিতার ফাঁদে পড়ে। অর্থাৎ ক্ষমতার প্রবল বৈষম্যই মদদ দিচ্ছে একটি অসুস্থ প্রতিযোগিতার এবং নারীকে পরিণত করছে এর শিকারে, পরিণত করছে একটি পণ্যে। আজকের দিনের এই করপোরেট যুগে এসে এরকম অনেক সত্যকে আমাদের এড়িয়ে যেতে হচ্ছে আর সাথে সাথে চলে আসছে অনেক প্রশ্ন।

কেস স্টাডি

কেস ১ : রাফিয়া বিনতে হাবিব (ছদ্মনাম) কাজ করেন একটি অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের বিপণন বিভাগে, যেখানে তাকে ন্যূনতম বেতনের সাথে দেয়া হয় বিক্রিত ঋণের ওপর কমিশন। অর্থাৎ যে মাসে তার কোনো ঋণ বিক্রি হবে না, সে মাসে ওই ন্যূনতম বেতনটুকুই তার একমাত্র সম্বল, তাতে জীবিকার পুরোটা সংস্থান হোক বা না হোক। এছাড়া কিছু প্রতিষ্ঠানে ঋণ বিক্রির ক্ষেত্রে এই ন্যূনতম বেতনটুকুও দেয়া হয় না। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, যারা অতি সম্প্রতি ন্যূনতম বেতন সুবিধাটি চালু করেছে। আরো খানিকটা গভীরে প্রবেশ করলে লক্ষ করা যায়, এ সমস্ত পদে প্রতিষ্ঠানগুলো বাহ্যিকভাবে সুন্দরী এবং আকর্ষণীয় নারীদের বাছাই করে, যা আবশ্যিকভাবে একটি প্রশ্নের জন্ম দেয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নিয়ে। পণ্য এখানে কোনটি, ঋণ নাকি নারী? কেন নারীদের এভাবে ঠেলে দেয়া হয় অনিশ্চয়তার ভেতরে? অনেকেই বলে থাকেন যে, না-গেলেই হয় এমন চাকুরিতে; কিন্তু চাকুরির প্রয়োজন কার নেই? কেউ না কেউ তো অবশ্যই পড়বে এই অনিশ্চয়তায়। প্রতিষ্ঠান এখানে ধ্রুবক আর কর্মচারী বা কর্মকর্তাগণ এখানে চলক রূপে কাজ করছে, কিন্তু চলকের স্বার্থে এখানে ধ্রুবককেই পরিবর্তিত হতে হবে, করতে হবে জবাবদিহি।

কেস ২ : মৌমিতা শবনম (ছদ্মনাম) মিডিয়ায় সাংবাদিকতার কাজ করতে ইচ্ছুক কলেজ জীবন থেকেই। সে ইচ্ছা থেকেই দীর্ঘদিন ধরে প্রিন্ট মিডিয়ায় কাজ করতেন কন্ট্রিবিউটর হিসেবে। ধীরে ধীরে গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে থাকেন আর একটু একটু করে গড়ে তুলতে থাকেন নিজের স্বপ্নের ক্যারিয়ার। যেহেতু তাঁর পরিবার মিডিয়ায় সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নিতে দিতে চায় নি, তাই সম্পূর্ণ নিজের তাগিদে এবং নিজের শ্রমে ও ব্যবস্থাপনায় মাস্টার্স করার পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছিলেন নিজের স্বপ্নের ক্যারিয়ার গড়ার প্রয়াসে। এরই মধ্যে সিভি জমা দেন একটি বেসরকারি নিউজ চ্যানেলে, প্রাথমিকভাবে ডাক পড়ল এবং কথা হলো একজন স্বনামধন্য নিউজ এডিটরের সঙ্গে। কিন্তু সেই কথিত ভদ্রলোকের ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষা পড়তে দেরি হয় নি মৌমিতার। যেহেতু প্রতিষ্ঠানের চেইন অব কমান্ড ভেদ করে যেতে পারে নি মৌমিতা, তাই সেখান থেকে সম্পূর্ণরূপে চলে এসে ব্যাংকিং সেক্টরে শুরু করেন নতুন ক্যারিয়ার। এখানে প্রশ্ন তোলা যায়, যেই মানুষটি কিশোর বয়স থেকে স্বপ্ন দেখে আসছিলেন যে বড়ো হয়ে কী হবেন, এমনকি সেই স্বপ্নের পথে অনেকদূর এগিয়েও গিয়েছিলেন, তাকে কেন প্রতিষ্ঠানের এহেন ক্ষমতাবানদের কারণে স্বপ্নের কাছাকাছি এসেও ফিরে যেতে হলো? এ তো শুধু ফিরে যাওয়া নয়, এ তো একজন নারীর স্বপ্নকে হত্যা করাও বটে। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আড়ালে, ক্ষমতার অসম বণ্টনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান কি তাহলে এসব হত্যাকারীকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে? এহেন তথাকথিত উপরওয়ালারা যখন কথিত লেনদেনে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন, তখন প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র নিয়ে যেমন সন্দেহ জাগে, তেমনি প্রশ্ন জাগে একটি নতুন শব্দ নিয়ে, যে, এই কি তবে সেই কথিত 'করপোরেট কালচার', যা মানুষকে পণ্য বানিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে? তাহলে এর শেষটা কোথায় যেয়ে ঠেকছে, তা কি খানিকটা হলেও আমরা অনুধাবন করতে পারছি না?

কেস ৩ : একটি আন্তর্জাতিক ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকিউরমেন্ট বিভাগে কাজ করেন নায়লা শারমিন, বুয়েট থেকে পাস করে অত্যন্ত সফলভাবে শেষ করেন এমবিএ, একটি সাফল্যমণ্ডিত ক্যারিয়ারের আশায়। ইন্টারভিউর ৭টি ধাপ পার হয়ে অবশেষে সুযোগ পান কাঙ্ক্ষিত অবস্থানটির। আনন্দের রেশ কাটতে না-কাটতেই অত্যন্ত নীরব ও শান্ত মেয়েটি টের পেয়ে যান যে প্রতিষ্ঠানের

ভেতরও আরেকটি প্রতিষ্ঠান ছায়ার মতন কাজ করছে, যেখানে ব্যক্তিক সম্পর্ক এবং অসুস্থ একটি প্রতিযোগিতাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। গ্রুপের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী এবং শান্ত হিসেবে পরিচিত মেয়েটি মুখ বুজে একের পর এক কাজের বোঝা শেষ করে যেতে লাগল, তবু যেন বসের তুষ্টি নেই। বাড়তে লাগল কাজের পরিধি আর মেয়েটি ভাবল কাজের সঠিক মূল্যায়ন বুঝি হবে; কিন্তু না, ব্যক্তিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রমোশন হলো গ্রুপের অন্য এক পুরুষ সহকর্মীর। বলতে গেলে যিনি মেধা ও শ্রমে খানিকটা পিছিয়েই। তবু হাল ছাড়ে না নায়লা, পরিবারের কথা ভেবে আর ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করে আবার শুরু করে পরবর্তী রেসের জন্য পরিশ্রম। নাহ! এবারও নায়লা ব্যর্থ। প্রমোশন পেয়ে সিনিয়র হয়ে যায় চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া নতুন 'স্মার্ট' মেয়েটি, যদিও করপোরেটের চোখে স্মার্টের সংজ্ঞা ভিন্ন, কারণ চার দেয়ালের ভেতরে এ এক অন্য জগৎ, অন্য সংস্কৃতি। তবু মেধার মূল্যায়ন তো থেমে থাকবে না। এক জায়গায় না হলে অন্য জায়গায়, একদিনে না হলে একশো দিনে হলেও শ্রমের মূল্যায়ন তো হবেই। তবে উদ্বেগের কথা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঠিক এভাবেই যদি প্রতিযোগিতা চলে, তাহলে ক্ষমতা তাদের হাতেই চলে যায়, যারা মেধা ও শ্রমে তুলনামূলক দুর্বল। আর এটা তো জানা কথা যে, দুর্বলের আধিপত্য ভয়াবহ। যাই হোক, এ ঘটনার এক মাসের মধ্যেই নায়লা চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং কাজ পেয়েও যান আরেকটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে, যেখানে রয়েছে কাজের অবাধ স্বাধীনতা এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব।

সমস্যা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

উপরের তিনটি কেসকে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনটি ক্ষেত্রেই নারী ভিকটিমে পরিণত হচ্ছে। সংগঠনের এহেন কদর্য রূপের সাথে যে খাপ খাওয়াতে না-পেরে চলে এল, সেও সাংগঠনিক ক্ষমতার বলে তথাকথিত চর্চিত কালচারের শিকার; আবার যে নারীটি পরিবারের দায়ে, রোজগারের দায়ে বেরোতে পারে নি বরং ক্ষমতার ঘূর্ণায়মান চরকায় চরকির মতো পাক খাচ্ছে, সেও রূপান্তরিত হচ্ছে ভিকটিমে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, উভয়ক্ষেত্রেই তাহলে এ দায় বর্তায় কার কাছে? উত্তরটা আমাদের জানা, সংগঠনের কাছে। তাহলে সংগঠন কেন এতদিনেও তার এই দায় মোচন করছে না? সেক্ষেত্রে কি আরো প্রশ্ন চলে আসতে পারে না যে, ক্ষমতা, নেতৃত্ব এবং পুরুষ সমার্থক শব্দ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বলেই সংগঠন এতদিনেও তার এই অন্ধকার দিককে জলাঞ্জলি দিতে পারল না? উল্লিখিত সমস্যা এবং এর বিশ্লেষণ থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, তা হলো—

ক্ষমতা = নেতৃত্ব = পুরুষ

যেখানে,

ক্ষমতা = পুরুষ
নেতৃত্ব = পুরুষ

অর্থাৎ এটা আসলে সংগঠনের সেই অন্ধকার দিক, যাকে আশ্রয় করে নারীর চারপাশে অদৃশ্য দেয়াল তুলে নারীকে পরিণত করা হচ্ছে ক্ষমতার শিকারে এবং নারী রূপান্তরিত হচ্ছে পণ্যে। একই সাথে রহিত করছে নারীর সার্বিক উন্নয়নের স্বপ্নযাত্রা।

যদিও সমস্ত প্রতিষ্ঠান একই মাপকাঠিতে পরিমাপিত হয় না, তবু কথিত করপোরেট কালচার নামের একটি নতুন শব্দ ধীরে ধীরে সকলের মনেই জায়গা করে নিচ্ছে। সহজে কার্যোদ্ধার হলে কঠিন পথটা আর কেউ মাড়াতে চায় না, ধীরে ধীরে সকলেই অভ্যস্ত হয়ে যায় একটি লুকানো কাঠামোতে, যা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় টেনে আনে ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতার লোভে, যার সবচেয়ে বড়ো শিকারে পরিণত হচ্ছে নারী। যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই যদি করপোরেট থাবা ছড়িয়ে থাকে, তাহলে অসহায় নারী হয়ে যায় খেলার পুতুল। সকলেরই তো বুয়েট বা আইবিএ ডিগ্রি নেই, আর ব্যক্তিক মূল্যায়নের চাইতে প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন তো আমাদের দেশের আরেকটি সংকীর্ণ ধারণা, তাই অনেকের লড়াইটা হয়ে ওঠে আরো বেশি ভয়ঙ্কর। করপোরেট বাজিকরের এ খেলায় কেউ জিতে যায় আর কেউ হেরে যায়। যে হেরে গেল তাকে তো আসলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার অসম ব্যবহারই হারিয়ে দিল। যদি এই হেরে যাওয়া মানুষের সংখ্যা একজনও হয় (যদিও সংখ্যাটা অনেক), সেই দায় তো প্রতিষ্ঠান এড়াতে পারবে না। এড়াতে পারবে না এ পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোও, যেখানে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে গুটিকয়েক ক্ষমতাবান বা ঊর্ধ্বতনের কাছে, যাদের ব্যক্তিগত লোভ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে নারী পরিণত হচ্ছে শিকারে অথবা জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হচ্ছে নিজের স্বপ্ন এবং মেধাকে। যখন সংগঠনের ভেতরে ক্ষমতার লড়াইয়ের নাটকগুলো ছায়ার মতন সাংগঠনিক কাঠামো দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তখন তা সংগঠন ও সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে, যা পরবর্তী সময়ে সংগঠনের অস্তিত্বকেও ফেলে দেয় হুমকির মুখে। আর এ সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ সংগঠনকেই বের করতে হবে। সংগঠনকে হতে হবে স্বচ্ছ ও করতে হবে জবাবদিহি। ক্ষমতার অপব্যবহারের বদলে ক্ষমতাচর্চা করতে হবে সঠিকভাবে, একই সাথে সৃষ্টি করতে হবে জনসচেতনতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ।

কামরুন মুন্নি প্রভাষক, একাডেমি ফর এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট। kamrunmunny@gmail.com।